একটি অসম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত একজন কবির নাম উৎপলকুমার বসু। জীবন্ত এবং কৌতূহলোদ্দীপক। অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে উৎপলকুমার নিবিড়-ভাবে যুক্ত। ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। কবিতার ভাষাগত দিক থেকে তিনি তরুণতম বাঙালি কবির সঙ্গী। তাঁর কবিতার পাঠক মূলত তরুণ কবিরাই, যারা আজও তাঁর কবিতার প্রতিটি নড়াচড়া সম্বন্ধে কৌতূহলী। তাঁর কবিতার সম্বন্ধে পাঠকদের তিনি দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহী করে রেখেছেন। এর কারণ, তিনি তাঁর প্রতিটি লেখাতেই নতুনতর হয়ে উঠতে চান। তাঁর নবীন হয়ে ওঠার এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে একাত্ম করেছে।

শহরতলির ইস্কুল ছেড়ে আমি কলকাতার কলেজে ভর্তি হই ১৯৭৫ সালের শেষে। নতুন কবিতা লেখার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তখন আমার সর্বস্ব জুড়ে। সেই সময়ে তরুণ সাহিত্যিক-মহলে বাঙালি লেখকদের লেখা যে-কটি বই ঘন ঘন আলোচিত হতে শুনতাম ‘পুরী

সিরিজ' তাদের অন্যতম। অথচ উৎপলকুমার তখন ছিলেন ভারতবর্ষের বাইরে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনো যোগাযোগই ছিল না। দুটি মাত্র কবিতার বই প্রকাশ করে, হঠাৎই স্বদেশ ত্যাগ করে তিনি তখন ইয়োরোপের দেশ থেকে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এক শ্রেণীর পাঠকের হৃদয় ও মনে তিনি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলেন। ওই সময়ে হঠাৎই একদিন এক বন্ধুর মুখে 'পুরী সিরিজ'-এর শেষ কবিতাটি শুনি, একাধিক বার। বন্ধুর পড়া শুনেই বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত এক হাহাকার ও বিষণ্ণতায় মনটা ভরে গিয়েছিল। কবিতাটি হল :

এই সংগ্রহের শেষ কবিতা

'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকত।
সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ওরা ধানকল পার হয়ে চ'লে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছে বাদাম পাহাড়ে।
আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে।'

কবিতাটির ঝলমলে নতুন ভাষা এবং ভয়াবহ সব ঘটনার বর্ণনা ও ছবি আমাকে মুহূর্তের মধ্যে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি ও ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা বাদামপাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া ; সজল, সজলের বউ ও মেয়ের ধানকল পার হয়ে চলে যাওয়া, প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভেতর নেমে দু'জন মানুষের তামা ও অভ্র খোঁজা—এসব বাংলা কবিতায় আগে পাইনি। ছেদচিহ্নহীন পঞ্চম পঙ্‌ক্তির 'সম্ভাবনাহীন' শব্দটির আশ্চর্য ব্যবহারও আমার চোখে পড়েছে। আসন্ন সর্বনাশের এই ছবিকে আরও বেশি ভয়াবহ করে তুলেছে একা ময়ূরের খালি দোতলায় ঘুরে বেড়ানো। 'দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল সার্ট পাজামার মতো বাস্তবিক' আকাশের প্রেক্ষাপটে আঁকা এই গোটা ছবি আমাকে মুহূর্তের মধ্যেই উৎপলকুমারের একজন অনুরাগীতে পরিণত করেছিল।

উৎপলকুমারের কবিতা নিয়ে টুকরো টুকরো কিছু আলোচনা চোখে পড়েছে। কিন্তু ব্যক্তি উৎপলকুমার বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। উৎপলকুমারের মুখ থেকেই তার জীবন বিষয়ে কিছু কথা জানার জন্যে গত ১৬.৬.৯৪ তারিখে আমি তাঁর কর্মস্থলে গিয়েছিলাম। আমি যে যাব তা আগে থেকে ঠিক করা ছিল। গিয়ে

দেখি তিনি তাঁর টেবিলে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা লিখে চলেছেন। আমাকে দেখে হেসে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। চা এল। উৎপলকুমারের বেশভূষা অতি সাধারণ। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত তিনি অত্যন্ত সৌম্যদর্শন। বড় বড় চোখ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, ফরসা গায়ের রঙ, মুখে সব সময়েই মিষ্টি হাসি। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। লেখা শেষ করে উৎপলকুমার বললেন, চল, অন্য একটা ঘরে গিয়ে বসা যাক। আমরা ছোট মতো একটা ঘরে গিয়ে বসলাম।

আলোচনার প্রথমেই উৎপলকুমার জানালেন : আমার জীবন ঘটনাবহুল নয়, মানডেন, বিশেষ কিছুই জানানোর নেই। খুব বড় একটা একান্নবর্তী পরিবারে আমার জন্ম, যেখানে জন্ম এবং মৃত্যু নিয়তই ঘটে চলত।

জানতে চাইলাম, আপনার জন্ম-তারিখ কী? —'স্কুলের খাতা অনুযায়ী আমার জন্ম-তারিখ ৩রা আগস্ট, ১৯৩৭। তবে, এই তারিখটা ঠিক না হবার সম্ভাবনাই বেশি। সালটা ৩৫ বা ৩৬-ও হতে পারে। তবে আমার জন্মের বাংলা তারিখ ৮ই ভাদ্র।'

আপনার বাবা-মা এঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন। —'বর্তমানে মা-বাবা দু'জনেই মৃত। বাবার নাম প্রফুল্লকুমার বসু। ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে কাজ করতেন। মায়ের নাম সন্তোষিণী বসু। মা যখন মারা যান তখন বয়েস আমার আট বা দশ। মা বেশ একটা রোগভোগের পর মারা গিয়েছিলেন। মা-বিষয়ক স্মৃতি বলতে মনে পড়ে অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, শল্যবিদরা মায়ের দেহ বহুবার কাটা-ছেঁড়া করেছেন। আমার মা-র মৃত্যুর কয়েক মাস পর ভারতবর্ষে পেনিসিলিন আসে। শুনেছি, সময়মতো প্রয়োগ করলে মা হয়ত ভালো হয়ে যেতেন।

মনে পড়ল :

'সীমাহীন কুয়াশায় তেমনই উঠেছ কেউ আমার মতন
ভয়ে, দুঃখে, মায়ের হাসির শব্দে !...'

জিজ্ঞাসা করলাম, মা সম্পর্কে আপনার কোনো স্মৃতি নেই? —'মা অসুস্থ ছিলেন বলে আমি এক নিঃসন্তান মাসির কাছে মানুষ হই, কুচবিহারের দিনহাটায়। খুব ছেলেবেলাতেই মাসির কাছে চলে যাই। দিনহাটা উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই মা মারা যান। তখন ছোট থাকার জন্যে মাতৃশোক বুঝতে পারিনি। তবে মনে আছে, মাসি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন।'

আপনার জন্ম কোথায়? —'আমার জন্ম কলকাতায়। আদি নিবাস মালখাঁনগর, বিক্রমপুর। আমাদের পরিবারের ইতিহাস একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ট্রেস করা যায়। আমাদের আদি পদবি ছিল বসুঠাকুর। আমার ঠাকুরদা, কেন জানি না, ঠাকুর অংশটা ত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে স্থানীয় মানুষজন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে শুনেছি।'

উৎপলকুমার মা-বাবার তৃতীয় সন্তান। তাঁর দুই দাদাই তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড়

ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল পিঠোপিঠি ছোট বোনের সঙ্গে। দাদাদের নাম পরিমলকুমার এবং অমলকুমার। বোন নীলা মজুমদার। হায়দ্রাবাদে তার ঘরসংসার। শৈশবস্মৃতি বিষয়ে জানতে চাওয়ায় উৎপলকুমার জানালেন, 'দিনহাটা ছিল একেবারেই গন্ডগ্রাম। টিনের ঘরের স্কুলে পড়তাম। কাছাকাছি বড় শহর বলতে কুচবিহার। আলোকপ্রাপ্তির জন্যে আমাদের কুচবিহারে যেতে হত মিটার গেজ ট্রেনে চেপে। দিনহাটার বিখ্যাত ছিল হাট। সেই হাটে প্রচুর পরিমাণে পাট ও তামাক বিক্রি হত। গ্রামে ছিল ছোট নদী ধরলা, কুচবিহারে তোর্সা এবং জলপাইগুড়িতে তিস্তা। ছোটবেলায় সাইকেল ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। দশ-বারো বছর বয়েস থেকেই আমি দক্ষ সাইকেলচালক। সাইকেলের মেকানিজম আমি খুব ভালো জানতাম। গ্রামের জীবন নিঃসঙ্গ ছিল। তাছাড়া আমি ছিলাম বাইরের ছেলে, খাস কলকাতার। তাই দীর্ঘসময় ধরে একা একা কোনো কিছু অবজার্ভ করার একটা প্রবণতা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ন্যাচারাল সায়েন্টিস্ট-এর মতো পোকা-মাকড়, গাছের পাতা সংগ্রহ করতাম। ছোট ল্যাবোরেটরি বানিয়েছিলাম। সাপ-গিরগিটি পুষতাম।

জিজ্ঞাসা করি, সাহিত্যের প্রতি সে-সময়ে কোনো উৎসাহ বোধ করেননি? —'সাহিত্যের প্রতি সেভাবে কখনো উৎসাহ আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, জানো, সাহিত্যের আগ্রহ ঠিক সেভাবে আমার মধ্যে আজো আসেনি। আমি সাহিত্যের ধার ধারি না। আমার বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটা হল সাহিত্য। সাহিত্যকে কখনোই প্রায়োরিটি দিইনি, আজও দিই না। অন্য যে-সব কাজ আছে যেমন মানুষকে বোঝা, মানুষকে জানা, তারপর মানুষের শরীর এবং মন— এ-দুটো বিচ্ছিন্ন করে বা একত্র করে দেখা— এসব আমি চেষ্টা করেছি। অনেকে যেমন ছেলেবেলায় সমস্ত শরৎচন্দ্র পড়ে ফেলল কি বঙ্কিমচন্দ্র— আমার বেলায় তা ঘটেনি। ছেলেবেলায় আমি সমস্ত সাইকেল খুলে ফেলে আবার জুড়তে পারতাম।'

কিছুটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আপনার সাহিত্যচর্চা কীভাবে শুরু হয়েছিল?— 'স্কুলজীবনের শেষ দিকে— আমার হাতের লেখা ভালো ছিল বলে অনেকেই আমাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে আসত। আমার কাজ ছিল সে-সব গুছিয়ে লিখে দেওয়া। আমার মনে হয় এই চিঠি লিখে দেওয়া থেকেই আমার ক্রিয়েটিভিটির শুরু। খুব ছেলেবেলায় হয়ত মৌলিক কিছু লিখেছিলাম স্কুল ম্যাগাজিনে— সেসব মনে নেই'।

আপনার কলেজজীবন এবং সে-সময়ের সাহিত্যচর্চা বিষয়ে কিছু বলুন। —'আমি স্কুলফাইনাল পাস করি ১৯৫২ সালে। তারপর দিনহাটার স্কুল ছেড়ে ভর্তি হই কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। আই. এস সি. ক্লাসে। কলেজ ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটা বাক্স রাখা হয়েছিল। আমি সেই বাক্সে একটা কবিতা ফেলে দিয়েছিলাম। কবিতাটা ছাপা হয়েছিল। ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপক মজুমদারও ওই কলেজেই পড়ত। ওরা দু'জনেই আমার থেকে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়ত। একদিন দীপক নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ

করল। বলল : ম্যাগাজিনে আপনার লেখা পড়েছি। ভালো লেখা। —আমরা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। কিছু পরে সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) এল, আনন্দ বাগচী এল। সেই থেকে আমার রাত করে বাড়ি ফেরা শুরু। ওই সময়ে ডাকে হঠাৎই দুটো কবিতা পাঠাই। ১৯৫২-৫৩ সাল। একটা 'পূর্বাশা'য় আর একটা 'দেশ'-এ। দুটো লেখাই ওদের পুজোসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। প্রথমে যাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে 'পূর্বাশা' অফিসে। সঞ্জয়বাবু এত বড়মাপের মানুষ ছিলেন যে উনি আমাকেই আমার কবিতা ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। লজ্জার কথা। আমার কবিতাটা ছাপিয়ে উনি খুশি হয়েছিলেন। সঞ্জয়বাবু আমাকে ম্যাকনিস্-এর 'মহাবলিপুরম্' অনুবাদ করতে বলেন। আমি বলেছিলাম : এ আমি পারব না। অত ভালো ইংরাজি আমি জানি না। উনি সাহস দিয়ে বলেছিলেন : না, না চেষ্টা কর, পারবে।— ওই অনুবাদ আমি অবশ্য করিনি। 'দেশ' পত্রিকায় আমার লেখা নির্বাচন করে ছাপিয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রথম কবিতার পাতার একদিকে জীবনানন্দের, একদিকে বুদ্ধদেব বসুর এবং তলায় আমার ছোট্ট একটি কবিতা। 'দেশ' পত্রিকার অফিসে একদিন গিয়েছিলাম। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অতি ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন আমার সঙ্গে। আমার হাতে একটি 'দেশ' পুজোসংখ্যা ও একটি পাস দিয়েছিলেন। সেই প্রথম জানলাম পত্রিকার আপিস থেকে পত্রিকা নিয়ে বেরুতে গেলে 'পাস' লাগে। যত দূর মনে পড়ে, এটা ১৯৫৩ সালের ঘটনা। 'দেশ'-এ কবিতা লেখার জন্যে আমি পঁচিশটা টাকাও পেয়েছিলাম।··· সে-সময়ে আমাদের আড্ডা বসত দীপকের বাড়িতে। সুনীল, আনন্দ, ভাস্কর, আশু, নৃসিংহ, অতীন, শ্যামাপদ··· সেই আড্ডায় নিয়মিত আসত। ওইখানেই 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা করা হয়।'

উৎপলকুমার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন ; তবে 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম সংখ্যায় তাঁর কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি। বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গে উৎপলকুমার জানালেন, 'না, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কখনও আলাপ হয়ওনি। 'কবিতা' পত্রিকায় লেখা পাঠাইনি কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল, ওখানে সব কুশলী ও বিখ্যাত লোকেরা লিখে থাকেন। তাছাড়া, আমি যখন লেখালেখি শুরু করি তার কিছুদিন পরেই বুদ্ধদেব বিদেশে চলে যান। এবং বুদ্ধদেব যখন বিদেশ থেকে ফিরে এসে জাঁকিয়ে বসলেন, আমি তখন বিদেশে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলাপ হয়নি কিন্তু কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে খুব আলাপ ছিল, সে-সময়ে কমলকুমারের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়ি।'

'আর কোন্ পত্রিকায় আপনার লেখা প্রকাশিত হত ?' —'অগ্রণী'-তে একসময়ে প্রচুর লিখেছি। 'অগ্রণী'-র প্রতি সংখ্যাতে শক্তি, বিনয় বা আমার লেখা থাকতই।'

আই. এস সি. পাস করার পর আপনি কী পড়েছিলেন ? —'স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এস সি পাস করার পর আমি আশুতোষ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে ভর্তি

হই। কিন্তু কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়াশোনা আমি শেষ করতে পারিনি কারণ অনার্স পড়ার রিজিডিটি আমার সহ্য হত না। আমি পাস কোর্সে বি. এস সি. পাস করি। লেখাপড়ায় আমি ছিলাম মাঝারি বা খারাপের দিকে। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হবার ইচ্ছে ছিল। বি. এস সি. পাস করার পর আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওলজি নিয়ে এম. এস সি. পড়ার সুযোগ পাই। এই সুযোগ পাওয়ার কথা নয় কারণ আমার অনার্স ছিল না। তারপর জিওলজি নিয়ে এম. এস সি. পাস করি।'

আপনার প্রথমদিকের কবিতায় জীবনানন্দের সরাসরি প্রভাব আছে। —আমি এ-কথা বলতেই উৎপলকুমার বললেন, 'আমাদের আড্ডায় জীবনানন্দ বারবার পড়া হত, আর কারুরই কবিতা বিশেষ পড়া হত না। তাই সে-সময়ে জীবনানন্দকে এড়ানো মুশকিল ছিল'।

কীভাবে আপনার লেখাকে আপনি নতুন করতে চেয়েছিলেন, জীবনানন্দের প্রভাব এড়িয়ে ?— আমাকে আবার অবাক করে দিয়ে তিনি প্রথমেই বললেন, 'আমি ঠিক সাহিত্য, কবিতা বা এই সব বিষয়ের লোক নই বলে— আমার মনে হয়েছে, অন্য জিনিস আমি করতে পারি। যেমন নতুন চিত্রকল্প বা অন্য ধরনের ভাষা। লোকের মুখের কথাকে আমি সরাসরি কবিতায় নিয়ে এসেছি। খুব নিঃসঙ্গ ছিলাম বলে ছেলেবেলায় আমার আড়িপাতা স্বভাব ছিল। আমি এখনও ঘুমের মধ্যে ছেলেবেলায় শোনা বিভিন্ন কণ্ঠস্বর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা শুনতে পাই। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে যাওয়ার প্রবণতা আমার আছে।

হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে আপনি কীভাবে যুক্ত হলেন ? —'হাংরি জেনারেশন সে-ভাবে কোনো সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। যার খুশি, যেখান থেকে পারে, বুলেটিন বের করে হাংরি জেনারেশন নাম দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিত। এই আন্দোলন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কতকগুলো ফতোয়া মলয়, সমীর, শক্তি— এরা লিখেছিল। এ-গুলোর নিচে অনেকের নাম দিয়ে দেওয়া হত। বহুক্ষেত্রেই যাদের নাম দেওয়া হচ্ছে তাদের জিজ্ঞাসাও করা হত না। জিওলজি পড়ার সূত্রে আমি চাইবাসায় ফিল্ড ওয়ার্কে যেতাম। সেখানে সমীর ও মলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সমীরের বৌ বেলা আমাদের মনোহরণ করে। সুনীল, শক্তি, সন্দীপনও যেত। হাংরিদের সে-ভাবে কোনো কাগজও ছিল না। হয়ত ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুল— নাম দিয়ে দিল হাংরি-জেনারেশন বুলেটিন, নম্বর ১২, হয়ত তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।...'

সাহিত্য ছাড়াও হাংরিদের নামে নানা কথা শোনা যায়। যেমন, ওঁরা নাকি 'দেশ' পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে জুতোর বাক্স পাঠিয়েছিলেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের ডেকে নগ্ন বক্ষ আদিবাসী মহিলার নাচ দেখিয়েছিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করি।

'হ্যাঁ এরকম আরও বহু অভিযোগ ছিল। তবে, এগুলোর অনেক কিছুই বানানো। কাকে নাকি একবার ফোন করে বলা হয়েছিল, আপনার ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাড়ি ফিরে যান। এখন, এসব কে করেছে, কেন করেছেন, আদৌ করেছে কিনা

এ-সব আজ ট্রেস করা মুশকিল। পুলিশ ভেবেছিল হাংরি আন্দোলন একটা সংগঠিত ব্যাপার। তখন আমি রয়েড স্ট্রিটে থাকতাম। সেখান থেকে পুলিশ একটা ভ্যানে করে আমাকে লালবাজারে নিয়ে যায়। তখন লালবাজারে পুলিশ কমিশনার ছিলেন পি. কে. সেন। উনি প্রথমে আমাকে মৃদু ধমকালেন : আপনি কলেজের অধ্যাপক, ছেলেছোকরাদের ফিচলেমিতে কেন নিজেকে জড়ালেন ?··· আমি বললাম, আমি অত কিছু জানি না। সব কাগজে লিখি, ওদের কাগজেও লিখি। তবে আমি মনে করি, হাংরিরা লেখায় কোনো অসামাজিক কাজ করছে কিনা তার বিচার করুন এবং ওদের লেখাকে বিচার করুন লেখা হিসেবে। দুটো আলাদা জিনিস। যদি লেখার কথা বলেন, এদের লেখাকে যে-ভাবে অশ্লীল এবং অসামাজিক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেটা আমি মানতে রাজি নই। অন্য যে-সব অ্যাকটিভিটিজ— সে-সব বিষয়ে আমার মন্তব্য করা সাজে না কারণ ওগুলো সত্য কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। তারপর ওরা এ-সব ড্রপ করে দিয়ে মলয়ের 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটিকে অশ্লীল বলে শুধু মলয়ের বিরুদ্ধে কেস আরম্ভ করে।··· পুলিশ আমাকে বলে যে আপনি পুলিশের পক্ষে হয়ে যান, হয়ে গিয়ে বলুন যে আমি মনে করি না এ-লেখা অশ্লীল। তাহলে কেসটা আপনাদের পক্ষেই জোরদার হবে। তারপর, আমি পুলিশের পক্ষে বলি বা অন্য কারুর হয়ে বলি, আমি একই কথা বলেছি। আমি পুলিশের পক্ষে witness হয়েছিলাম কিন্তু I turned into a hostile witness.'

আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি পুলিশকে এরকম স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে হাংরিদের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই ? —'এরকম স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই। তবে হাংরিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই— এরকম বলা হাস্যকর। কারণ, ওদের প্যাম্ফলেট, ইস্তাহারে আমার নাম ছিল। তাছাড়া ওই সময়েই কলেজে আমাকে নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। সেই গোলমাল নিয়েই আমি বেশি জড়িত হয়ে পড়ি।'

প্রসঙ্গত বলি, হাংরি জেনারেশন কর্তৃক উৎপলকুমারের একটি ৬৯ লাইনের দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয় ফোল্ডারের আকারে, ১৯৬৩ সালে। ওই ফোল্ডারে প্রকাশনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ্তিটি ছিল এইরকম : **VERE PAPA MORTUUS EST/A Hungry Generation message on the death of Pope John XXIII/Text by UTPALKUMAR BASU/Published by Haradhan Dhara, 269 Netaji/Subhas Road, Howrah, on behalf of the Hungry Generation, Calcutta.**

হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে উৎপলকুমার পুলিশকে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা নিচে দেওয়া হল :

'আমি অবিবাহিত এবং আমার বয়স ২৮ বছর। বর্তমানে আমি ২৩ রয়েড স্ট্রীটে

থাকি। আমি জিওলজিতে এম. এস সি. ও আশুতোষ কলেজে প্রভাষক। ১৯৬২ সনে বা তার কাছাকাছি কোনও এক সময়ে হাংরি পুস্তিকা আমার নজরে পড়ে। আমি সাহিত্য আন্দোলনে আগ্রহী ছিলাম। পরে আমি মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হই যদিও তার বড়ো ভাই সমীর রায়চৌধুরীকে আমি আগে থাকতেই চিনতাম। কলেজ স্ট্রীট কফিহাউস এই আন্দোলনকারীদের আড্ডা মারার জায়গা। কিছুকালের মধ্যে হাংরি আন্দোলনের অন্যান্য শরিক যেমন শৈলেশ্বর সুভাষ দেবী রায় ওরফে হারাধন ধাড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। তাদের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে হাংরি-পুস্তিকায় গদ্য ও কবিতা লিখেছি। কোথা থেকে সেগুলি ছাপানো হতো আর কে তার খরচ যোগাতো তা আমি জানিনা। ১৯৬৪ সনে গ্রীষ্মে মলয় পাটনা থেকে কলকাতা আসে ও আমাকে প্রকাশিতব্য পুস্তিকার জন্যে লেখা দিতে বলে। আমি 'কুসংস্কার' নামে একটা লেখার পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিগতভাবে মলয়কে দিই। তারপর আমি দুমাসের জন্যে ডালহৌসী চলে যাই এবং কলকাতা ফিরে আমি আলোচ্য পুস্তিকাটি দেখতে পাই। পরে ডাকযোগে একটা কপি পেয়েছি। আমার মতে মলয় রায়চৌধুরীর লেখায় নিদারুণ বিরক্তি ও অসম্ভাব্যতার উপলব্ধি থাকে। আমি মনে করি তাদের সাহিত্য আন্দোলন নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে গেছে এবং আমি হাংরি আন্দোলন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছি। মলয়ের হাতের লেখা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।'

এই জবানবন্দী উৎপলকুমার দিয়েছিলেন ৫. ৪. ১৯৬৫ তারিখে। আদালতে উৎপলকুমার 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নিয়ে যা বলেন তার সঙ্গে পুলিশকে দেওয়া জবানবন্দীর কিছু পার্থক্য আছে :

'চার নম্বরে উৎপলকুমার বসু ১৪.৭.৬৫ তারিখে। তিনি জানালেন তিনি প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মলয় আর সমীরকে তিনি ভালোভাবে চেনেন। মাঝে মধ্যে কফিহাউসে হাংরি আন্দোলনকারীরা আড্ডা দিতো। মলয়ের লেখা তিনি পড়েন। হাংরি বুলেটিনে এখন আর তিনি লেখেন না কেননা এখন আর তা প্রকাশিত হয় না। মলয়ের কবিতাটা তিনি বেশ কয়েকবার পড়েছেন। তাঁর মনে হয় কবিতাটা উত্তেজিত অবস্থায় টেনশনের মধ্যে লেখা। নিঃসন্দেহে এটা নতুন ধরনের কবিতা। কবিতায় এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। কবিতাটিতে ডিসগাস্ট আছে বোঝা যায়।

ম্যাজিসট্রেট : উড ইউ কল ইট অবসীন ?

উৎপল : আই ডু নট নো হোয়াট ইজ মেন্ট বাই অবসীন। আই উড প্রেফার সামবডি এক্সপ্লেনস ইট টু মি।'

[সমীর রায়চৌধুরী কর্তৃক জুলাই, ১৯৯৪-তে প্রকাশিত মলয় রায়চৌধুরী লিখিত 'হংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের পৃ. ৮৪,৮৫ ও ৮৬ দ্রষ্টব্য। উপরের দুটি উদ্ধৃতিই ওই গ্রন্থ থেকে তোলা হয়েছে।]

আপনার কলেজের চাকরি নিয়ে কী গোলমাল হয়েছিল? —আমি জিজ্ঞাসা করি। —'এম. এস সি. পাস করার পর আমি আশুতোষ কলেজে পড়াতে শুরু করি। সকাল, দুপুর— নানা বিভাগে ভূতত্ত্ব পড়াতাম। ওই সময়ে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনা পাঁচ ছয়ের ছবি টাইম ম্যাগাজিনে বের হয়। সিঙ্গাপুরের এক সাংবাদিক ছবিটি তুলেছিলেন। ছবিতে সমীর, মলয়, আমি, দেবী রায়, সুবো আচার্য— এরা ছিলাম। ওই ছবি কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে এবং ওঁরা আমাকে তদন্তের জন্য ডাকেন। আমি নিজের লেখার ব্যাপারে সর্বদাই বেশ গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। ওঁরা জানতেন না যে আমি লেখালেখি করি। ওঁরা আমাকে বলেন যে আপনার বইপত্র দিন। আমি বলেছিলাম, আমার বইপত্র আমি তো দিতে পারব না, আপনারা জোগাড় করে নিন। এতে ওঁরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওই সব কলেজ চলত। মুখার্জি বাড়ির লোকেরা সব রাজার মতো বসে থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অধ্যাপকেরা, বাংলার, ইংরাজির— কী স্তাবকতাই যে এঁরা করতেন! ওঁরা আমাকে সাসপেন্ড করেন। কারণ, আমার লেখা একজন অধ্যাপকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এর জন্যে একটা বিচার কমিটি গঠন করা হয়েছিল যাতে প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় অধ্যাপকেরা ছিলেন।— সব একেকটি স্তাবক একেবারে— অশিক্ষিত। আমাকে ১৫ দিন পরপর কমিটির কাছে হাজির হতে হত। প্রায় ছ' মাস ওইভাবে চলল। কমিটির লোকেরা আমার লেখার বিচার করত! আমাকে জিজ্ঞাসা করত এর মানে কী, ওর মানে কী? হাস্যকর ব্যাপার! আসলে কলেজে আমার খুঁটির জোর ছিল না। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা হাংরি থেকে ব্যক্তির দিকে, আমার দিকে সরে যায়। ওরা ঠিক করেছিল আমাকে ছাড়াবে। আমি ঠিক জানি না আমার বিরুদ্ধে চার্জটা কী ছিল। ওরা একটা টাইপ করা কাগজে আমাকে সই করতে বলে যাতে লেখা ছিল: আমি যা লিখেছি তা একজন কলেজ শিক্ষকের উপযুক্ত নয়। এবং আমি ভবিষ্যতে আর এরকম লিখব না বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমি একটু ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলেছিলাম ১৫ দিন সময় চাই। সাহায্যের জন্যে অনেকের কাছে গিয়েছিলাম। মুখার্জি বাড়ির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে কেউ রাজি হয়নি। সাহায্য করেছিলেন Indian Committee for Cultural Freedom-এর A. B. Shah. পণ্ডিত লোক। উনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে ৮ পাতার চিঠি লিখেছিলেন। গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে খোঁজ পেয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর কাছে একদিন গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, আমি আপনাদের লেখা পড়েছি, আপনাদের লেখায় অন্যায় তো কিছু দেখছি না।—যাই হোক কলেজের চাকরিটা আমার যায়।'

এরপর আবার আমরা লেখালেখির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। জানতে চাই, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' প্রকাশের ইতিবৃত্ত, বইটা পাঠকদের কেমন লেগেছিল —এইসব।

'পঞ্চাশের শেষ দিকে আমাদের সকলেরই একটা চার ফর্মার বই বের করার হুজুগ ওঠে।

সবকটারই প্রকাশক ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা। পৃথ্বীশ খুব মন দিয়ে কাজ করত।— না, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' নিয়ে সে-ভাবে কোনো রিঅ্যাকশন হয়নি। কারণ প্রায় প্রতিমাসেই একটা করে অমন বই বেরুত আমাদের, বিনয়ের বই নিয়েও কোনো রিঅ্যাকশন হয়নি, যতদূর মনে পড়ে। পাশাপাশি মনে রাখা দরকার, তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের, অমিয় চক্রবর্তীর বই বেরুচ্ছে। লোকেরা এঁদের প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিল। সম্ভবত অলোকরঞ্জন আমার বইটা নিয়ে 'কৃত্তিবাস'-এই আলোচনা করেছিলেন।'

আবার জানতে চাই, কবিতাকে কীভাবে আপনি নতুন করতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে কি সচেতন কোনো প্রয়াস আপনার ছিল? —'কবিতাকে সচেতন ভাবে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে, আমি এখনও একটা লেখা বহুবার লিখি। লিখে ফেলে রেখে দিই। পরিবর্তন করি। এমন হতে পারে আমি কোনো পুরনো নাটক পড়লাম, তার দ্বারা প্রভাবিত হলাম। একটা গ্রিক কবিতার সংকলন পেয়েছিলাম, তার কিছু উপাদান কবিতায় ব্যবহার করেছি। তবে, কবিতাকে আধুনিক করতে গেলে মনটাকে আধুনিক করতে হয়।'

'চৈত্রে রচিত কবিতা' বইটির বিষয়ে কিছু বলুন। —'চৈত্রে রচিত কবিতা' শুরু করেছিলাম প্রকৃতির ব্যাপার দিয়ে। ঠিক কী ভেবে লিখেছিলাম এখন বলা শক্ত। তবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে আহরিত চিত্র, শব্দ ইত্যাদি আর 'বোধিত বিদ্যার জগৎ' থেকে পাওয়া নানা কৌশল ও উপাদান কবিতায় ব্যবহার করেছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে তখন আমরা ইয়োরোপীয় কবিতার স্বাদ পেয়ে গেছি। অ্যাংলো-আমেরিকান কবিতা ছাড়াও ওই সময়ে আমরা গ্রিক, ফরাসি ইত্যাদি কবিতার খোঁজ পাই।'

কবিতায় আপনি কী বলতে চেয়েছেন একটু বলবেন? —'পরিষ্কার করে বলা কঠিন। তবে এটা হতে পারে, আমি এখন খানিকটা বুঝতে পারি, আমার লেখায় অবচেতনের ব্যাপার, মিথিকাল ওয়ার্ল্ড-এর ব্যবহার প্রথম থেকেই রয়ে গেছে, টিপিকাল বাঙালি মিথ আমি ব্যবহার করিনি। কৃষ্ণ-রাধার উল্লেখ আমার কবিতায় নেই, তবে যমুনার উল্লেখ আছে। অনেকে মূল জিনিসটাকে বাদ দিয়ে একটা মাইনর জিনিসকে বড় করে দেখেন। জীবনানন্দ (বেহুলা-লখিন্দর মিথের) গাঙুরের জলকে বড় করে দেখেছিলেন। আমি মিথ-এর খণ্ডিত অংশকে ব্যবহার করেছি। শুধু মিথ নয়, আমি যে কনশাসনেস-টাকে ব্যবহার করেছি তা কিন্তু যৌথ অবচেতন বা কালেকটিভ আনকনশাসনেস। সে-মুহূর্তে আমি 'সূর্যঘড়ি'র কথা বলছি, 'শ্বেত রাত্রি'র কথা বলছি।'

'পুরী সিরিজ' বা 'আবার পুরী সিরিজ' সম্বন্ধে আমার নানা প্রশ্নের উত্তরে উৎপলকুমার বলেন, 'পুরী সিরিজ' কবিতাটি হাওড়াবাসী সমীর রায়ের 'মহেঞ্জোদারো' পত্রিকায় ছাপা হয়। তখন আমরা ধর্মতলায় সোডা ফাউন্টেনে আড্ডা দিতাম— ছবি আঁকিয়েদের

সঙ্গে। আমি সমুদ্র দেখি বেশ পরিণত বয়সে। প্রথমে দীঘা যাই। তারপর পুরী— দিন সাতেক ছিলাম— তবে তখন লিখিনি, পরে লিখি।

'চৈত্রে রচিত কবিতা' সহজবোধ্য কিন্তু 'আবার পুরী সিরিজ' এর বহু কবিতাই তা নয়।— এই বিষয়ে কিছু বলবেন? —'আমার এ সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা নেই। পাঠক কিছু বুঝতে পারল কি পারল না এতে আমার কিছুই যায় আসে না। খবরের কাগজের বুক রিভিউ-এর কথা বাদ দিলে— যা মনে আসে তাই লিখি। কিছুর ধার ধারি না। এই ডেসপারেটনেস-টা এসেছে যেহেতু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আমি সাহিত্যের প্রথা মেনে চলি না।'

পাঠকের ব্যাপারে কিছু না-ভাবাটা কি একজন লেখকের পক্ষে সর্বনেশে নয়?— আমি প্রশ্ন করি।

'পাঠকের কথা ভাবতে গেলে মাথায় অনেক চিন্তা আসে।··· বাক্য তৈরি করার যে প্রণালী— এটা অনেকটা দুর্বিনীতের মতো শোনাবে— সিনট্যাক্স-ভাঙা বাংলা কবিতায় আমিই প্রথম শুরু করি— এ পর্যন্ত আর কোনো কবি এ-কাজ করেননি। যেমন একটা কবিতায় ছিল: 'জাগো, রাণা কমলালেবুর বীজ প্রতাপের মতো' (শীতকাতর ঘুমের ভিতর গভীরতর ঘুম আছে: লোচনদাস কারিগর)।··· যেন একটা স্টেজ-এর মধ্যে এক-একজন কথা বলে যাচ্ছে। এই প্রলাপের মতো বলে যাওয়া— কোনো সিকোয়েন্স বজায় না রাখা— এটা কিন্তু মনোজগতের গভীর থেকে উঠে আসা এক নাট্যদৃশ্য।'

কিন্তু পাঠক এগুলোকে কী ভাবে নেবে? —আমার প্রশ্ন। —'আমি তো নানা আঙ্গিকে লিখেছি। যারা এরকম লেখে তাদের পাঠকের ওপর ভীষণ বিশ্বাস থাকে।— হয়ত আজ বুঝছে না কিন্তু আগামীকাল বুঝবে। এই বিশ্বাস আধুনিক কবিতার বিশ্বাস। এখানে পাঠককে কবির সমগোত্রীয় ধরা হয়। এজন্য কবিরাই আধুনিক কবিতার পাঠক। 'কৃত্তিবাস'-এর কোনো সংখ্যার সমালোচনা করতে গিয়ে কালিদাস রায় একবার আমার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, আর সকলের লেখা বোঝা যায় কিন্তু এর লেখা কিছুই বোঝা গেল না।··· Syntactical গোলমাল কিন্তু কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যায় না— এর জন্যে এক ধরনের প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়; শৃঙ্খলামোচন করা খুব মুশকিল। 'পুরী সিরিজ'-এর একটা বৈশিষ্ট্য দুটো জগতের মধ্যে আসা যাওয়া করা— একটা sane, balanced আর একটা insane, unbalanced।'

আপনার লেখার আপনি কি জগৎ ও জীবন বিষয়ে কোনো দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছেন?

— 'দর্শন যে-ভাবে জিনিসকে ব্যাখ্যা করে তার থেকে আমি বহু দূরে। কবিদের খেয়াল রাখতে হয় ভাষার সঙ্গে যৌনতার যোগাযোগ, ভাষার সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ।' ক্রিয়েটিভ লোকেরা এক-এক সময় গভীর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যায়— যাকে বলে dark night of the soul— এর মধ্যে দিয়ে না-গেলে নাকি ক্রিয়েটিভ লোক হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে পজিটিভ দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আমার 'প্রিয় হে সবুজ ফল/তোমাকে কঠিন হতে/দেব না, সবুজ ফল'— একধরনের আধুনিক মানুষের পজিটিভিজম্‌··· ।'

প্রসঙ্গ পালটে এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি হঠাৎ বিদেশে চলে গেলেন কেন? এর সঙ্গে কি হাংরি আন্দোলনের ব্যর্থতা বা কলেজের চাকরি যাওয়ার কোনো সম্পর্ক ছিল? —'আমার বিদেশ যাওয়ার সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের ব্যর্থতার কোনো যোগাযোগ ছিল না, তবে কলেজের চাকরি যাওয়ার সম্পর্ক ছিল।'

বিদেশে কোথায় আপনি প্রথম যান, সেখানে কী করতেন, সাহিত্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো কিনা— এসব বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

'আমি প্রথমে প্যারিসে যাই। সেখানে যোগেন চৌধুরীর কাছে থাকতাম, যোগেন একটা স্কলারশিপ পেত। প্যারিস থেকে লন্ডনে যাই। সেখানে নানা ধরনের কাজ করতাম। 6th form কলেজে (এখানের XI/XII ক্লাস) মাস্টারি করতাম। নানারকম পলিটিকাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম যেমন প্যালেসটিনিয়ান লিবারেশন ফ্রন্ট, আলজিরিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট, সাউথ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভিয়েৎনামের আন্দোলন। লন্ডনে একটা ইন্ডিয়ান ওয়ার্কারস' অ্যাসোসিয়েশন ছিল। আমি ছিলাম তার লন্ডন শাখার সেক্রেটারি। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। বিদেশে যাই ১৯৬৫ সালে এবং ভারতবর্ষে ফিরে আসি ১৯৭৮-এ। এই বারো বছর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রায় কোনো সম্পর্ক ছিল না। লিখেছিলাম 'নরখাদক' আর লিখেছিলাম দু-একটা কবিতা এবং অনেক চিঠিপত্র। তখন আমি বিরাট ডামাডোলের মধ্যে পড়েছিলাম।··· তখন আমি সংগঠিত মানুষের ক্রিয়া-কান্ড জানতে শুরু করি। ভারতবর্ষে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল অনেক দিন। বিদেশেই বিয়ে করি— ৬৯ সালে, এক বাঙালি মহিলাকে। একটা গাড়ি ছিল, ফোল্ডিং ছোট্ট তাঁবু ছিল। তাই নিয়ে ইয়োরোপের নানা দেশে খুব ঘুরতাম। আমি জিওলজিস্ট— ভুলে যাবেন না। এই সময়ে সাহিত্যের সঙ্গে আমার কোনো সংযোগ ছিল না।···

'বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমি দেশ ও ভাষাকে যেন পুনরাবিষ্কার করি। 'লোচন-দাস কারিগর', 'খন্ড বৈচিত্র্যের দিন', 'ধূসর আতাগাছ'— বিভিন্ন কণ্ঠস্বর সর্বত্র এসেছে। আমার নাটক/মঞ্চ প্রিয়তা আছে, এখনকার অনেক লেখাগুলোয় ডেলিরিয়াম আছে। কবি যেন ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছেন, একজন মনের দিক থেকে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে, স্প্লিট হয়ে গিয়ে, সব কিছু রেকর্ড করছে।··· 'ধূসর আতাগাছ' গদ্যের বই কিন্তু ওর মধ্যে এমন অনেক লেখা আছে যা গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি··· ধূসর জগৎ···'□